International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 15-27
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

প্রসঙ্গ গণগৌর ব্রত, প্রেক্ষাপট কোলকাতা : একটি সার্বিক আলোচনা

শুভঙ্কর মণ্ডল
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ইউ.জি.সি. নেট, শিল্পের ইতিহাস বিভাগ, দৃশ্যকলা অনুষদ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The people of India celebrate various types of ritualistic ceremonies. Most of the rituals are related with women and their domestic lifestyle. In the folk culture of India, the women of this country have created their own world. This world is constructed by their emotions, desires, expectances and their imaginations. They observe many vows and ceremonial rites for worshiping their gods and goddesses and for fulfilling their earthly desires and altruistic wishes. 'Gangour' is considerd as one of the biggest, colourful, traditional and retualiatic festivals of Marwari community and others in Rajasthan. Even wherever they have migrated, they have carried their tradition and culture. In West Bengal, specially in Kolkata and around the city, Gangour festival is celebrated by local Marwaris with a splendid manner. Every year, before the time of Gangour, the artisans of Kumartuli are engaged themselves for creating the clay images of God 'Isar', Goddess 'Gora' and others related with the occation. It has a great significance and importance in the field of folk art and culture. In this paper, the researcher tried to showcase a clear vision of this particular vow and gave an analytical discussion on it. This paper also concentrated on the role of local artists of Kumartuli and their creations in the context of this festival. there is a comparative discussion between Gangour and the other rituals and vows of Bengal, observed by the Bengali women.

Key Words- Gangour, Marwari, Kumartuli, Vow, Ritual, Kolkata.

ভূমিকা: ভারতের পশ্চিমভাগে অবস্থিত, মরুভূমির কোলে লালিত, প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটি রাজ্য - রাজস্থান। যেন মঙ্গলময় ঈশ্বর এমন এক রমণীর সৃষ্টি করেছেন যার সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে প্রকৃতির রুক্ষতার মধ্যে। সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা থেকে রাজপুতদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস যে রাজ্যের শিরমুকুট, প্রচলিত লোকগাথা, লোকসঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের মূর্ছনা যার কণ্ঠহার, রাজস্থানী অনুচিত্র হতে জয়পুরী ভিত্তিচিত্রের বর্ণময় উপস্থাপনা যার অঙ্গরাগ, বিস্ময়কর স্থাপত্যকলার অপরূপ শোভা যে রাজ্যকে পূর্ণতা দান করেছে, সেই রাজ্যের মারোয়াড়ী ললনাদের দ্বারা পালিত একটি ঐতিহ্যবাহী ব্রতানুষ্ঠান 'গণগৌর'। গণগৌর শুধুমাত্র একটি ব্রত নয়, বরং রাজস্থান তথা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে পালিত হওয়া লোকউৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। রাজস্থানের জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, মারাথওয়াড়া, জয়সলমীর প্রভৃতি অঞ্চলে এই গণগৌর মহোৎসবের রূপ নেয়। এই গণগৌরকে

কেন্দ্র করে আঠারো দিন ধরে নানা রকমের উৎসবের পাশাপাশি মেলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।[1] জয়পুরের গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় উৎসবগুলির মধ্যে গণগৌর অন্যতম। গণগৌর উপলক্ষে নির্মিত 'ঘেওয়ার' নামক একপ্রকার মিষ্টান্ন এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। উদয়পুরের পিচোলা লেকের কাছে অবস্থিত গণগৌর ঘাট গণগৌরের বিসর্জনের জন্যই বিখ্যাত।[2] তবে রাজস্থান ছাড়াও গুজরাট, হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে এবং খাস কোলকাতার বুকেও গণগৌর যথাচারে পালিত হয়।

গণগৌর ব্রত প্রসঙ্গ: এই ব্রতের কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন দেবী গৌরী - মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী দেবী পার্বতী। দেবী একাধারে উর্বরতা, সৌভাগ্য, ত্যাগ এবং আদর্শ সতীনারীর প্রতীক স্বরূপা। এই ব্রতের সঙ্গে একদিকে যেমন জড়িয়ে আছে বসন্তের উদযাপন তেমনই অতোপ্রত ভাবে জড়িত কৃষি, মাতৃকাশক্তি, উর্ব্বরাতন্ত্রের আরাধনামূলক দিকগুলি।

পুরাণমতে ভগবান শিব গণনাথ। তাঁর নাম থেকে 'গণ' এবং পার্বতীর অপর নাম গৌরী থেকে নেওয়া 'গৌর' শব্দের সংমিশ্রণে গণগৌর শব্দটির আগমন। এই ব্রত পালনের সময় 'ইসার' এবং 'গোরা' বা 'গৌরী' নামেই যথাক্রমে শিব ও পার্বতী পূজিত হন।[3] সব ব্রতের ন্যায় শিব ও শক্তির এই ব্রত পালনের পিছনেও আছে মনস্কামনা পূরণের তাগিদ। বাংলার ঘরের মেয়ে উমা বৎসরান্তরে একবার তাঁর বাপের ঘরে ফিরে আসেন চার পাঁচদিনের জন্য এবং বিজয়ার পুণ্যলগ্নে আবার পতিগৃহে ফিরে যান। ফলে বাঙালীর জীবনের এই চারপাঁচটি দিন হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠতম আনন্দঘন মুহূর্ত। একই ভাবে স্থানীয় মারোয়াড়ী লোককথা অনুযায়ী পার্বতী প্রতিবছর আঠারো দিনের জন্য তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করতে বাপেরবাড়ি আসেন এবং তৃতীয়ার দিন শিব এসে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ফলে এই কয়েকটা দিন মারোয়াড়ী মহিলারা নাচ, গান, আনন্দ, বিনোদনের সবটুকু স্বাদাস্বাদন করে নেন। এককালে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের জীবনযাত্রা এখনকার মতো সহজ ছিলনা। তাঁদের সংসারকেন্দ্রীক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হতো পিতা-স্বামী-পুত্রের দ্বারা। ফলে তাঁদের কামনা, বাসনা, চাহিদাগুলিও ছিল একান্তই নিজ সংসার, পরিবার, পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেন্দ্রীক। এই ধরণের ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সংসারের হিতকামনা করা যেত তেমনই একত্রে সমবেতভাবে ব্রতপালনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা খুঁজে নিতেন তাঁদের নিজস্ব অকৃত্রিম বিনোদন - এই নৃত্য, গীত, ছড়া কাটা ইত্যাদি বিষয়গুলি তারই অনুষঙ্গ।

প্রতিটি ব্রতের মতই এই গণগৌর ব্রতের সঙ্গেও জড়িত আছে কিছু কামনা, যা নারীদের একান্ত নিজস্ব। ব্রতের গল্পানুযায়ী শিব ও পার্বতী দেবদেবী হলেও তাঁরা পার্থিব জগতের জাগতিক বিষয়গুলি থেকে মুক্ত নন। তাঁদের মধ্যেও বেদনা, কামনা, সন্দেহ, কৌতূহল, সত্যগোপনের প্রবণতা আছে। সেখানে শিব সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ি যান, অন্যের প্রসববেদনা দেবীকে বিচলিত করে, শিশুজন্মের আনন্দে দেবীর মধ্যেও জাগে মাতৃত্বের কামনা। তিনিও আর পাঁচজন পতিব্রতা স্ত্রীর মতো স্বামীর ও সংসারের মঙ্গলকামনা করে একান্ত নিভৃতে শিবের পূজা করেন এবং শিবকেই তা গোপন করেন। গল্পের মধ্য দিয়ে দেবীর আড়ালে কোনো এক সাধারণ রমণীর মানসিক আবেগ ও অনুভূতিগুলিরই প্রতিচ্ছবি তথা সমাজের প্রতিরূপকেই তুলে ধরা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই আছে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ও ব্রত শেষে ফললাভের কথা। ব্রতিনীদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী ব্রতের ফলস্বরূপ অখন্ড সৌভগ্যসূচক 'সোহাগরস' ও সার্বিক মঙ্গলময়তার

চিত্র নং 1 সপরিবারে ইসার ও গোরা

আশীর্বাদ করেন। এগুলি ছাড়াও গণগৌর ব্রতে প্রচলিত কাহিনীগুলি হল, 'সুরজ রোটো কী কহানী' যেখানে সূর্যপূজা করার সুফল বর্ণীত হয়েছে। 'গণগোর কী কহানী'তে আছে এক মালী ও গণগৌরের ব্রতিনীদের গল্প, যেখানে বাগান থেকে দূর্বা তোলার জন্য মালীকে তার দাম দিতে মেয়েরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বিন্দায়কজী কী কহানী' আবার একটি ছোট্ট মেয়েকে ঘিরে যে বালকরূপী বিন্দায়কজী (মতান্তরে বিনায়কজী) অর্থাৎ গণেশ কে লাড্ডু খাইয়ে প্রভূত ধনসম্পত্তিলাভের আশীর্বাদ পায়।[4]

ব্রত পালনের নানা কথা: অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা যেমন আঠারো দিন ধরে এই ব্রত করেন একজন উপযুক্ত ও গুণসম্পন্ন স্বামী পাওয়ার আশায়, তেমনই বিবাহিতা ও সদ্য বিবাহিতারা এই ব্রত করেন স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে, সংসারে সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে, পতি-সোহাগিনী ও সৌভাগ্যবতী হওয়ায় আশায়। তবে বিধবারা এই ব্রতে অংশগ্রহণ করেননা। অনেকেরই ধারণা যে পার্বতী যে তপস্যাবলে মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন, এই ব্রত ঠিকঠাক ভাবে পালন করলে ঠিক সেই তপস্যার সমান পুণ্যফল লাভ করা যায়। নববিবাহিতারা তাঁদের বিবাহিত জীবনের অখন্ডতা ও সার্থকতা কামনা করে বিয়ের প্রথম বছর আবশ্যিকরূপে এই ব্রত পালন করে থাকেন। বিয়ের প্রথম বছর গণগৌরের প্রতিষ্ঠা স্বামী এবং স্ত্রী যুগলে করে থাকেন। ব্রতের উপবাস চলে সারাদিন ধরে, শুধুমাত্র সারাদিনে একবার আহারগ্রহণ করা হয়। এইসময় মহিলারা হাতে মেহেন্দি পরেন, নববস্ত্র ও নানা অলংকারে সুসজ্জিতা হয়ে শুদ্ধ মনে এই ব্রত পালন করেন। হোলিকা দহনের পরের দিন থেকে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে গণগৌরের পূজা ও ব্রত পালন শুরু হয়ে যায়। এই দিনটি 'ধুলন্ডী' নামে পরিচিত। চলে চৈত্রমাসের শুক্লা তৃতীয়া বা 'গৌরী তৃতীয়া' পর্যন্ত। তবে স্থানভেদে ও ব্যক্তিভেদে এই ব্রতের নিয়মবিধির কিছু বৈচিত্র দেখা যায়। যাইহোক, সম্বৎসরে একবার, আঠেরো দিন ধরে চলে এই ব্রতপালন। ব্রত পালনের দিন ভোরবেলায় ব্রতিনীরা প্রাতঃকর্ম সেরে শুদ্ধবস্ত্রে ও শুদ্ধাচারে ব্রতের আচার শুরু করেন। গণগৌরের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আচার হল হোলিকা দহনের ফলে সৃষ্ট ছাই সংগ্রহ করা। এই পবিত্র ছাই, গোবর ও মাটি দিয়ে ষোলোটি গোলাকৃতি ঢেলা বা 'পিন্ডিয়া' বানানো হয় এবং গণগৌরের আসনে সেগুলিকে স্থাপন করা হয়। পরবর্তী আটদিন এই পিন্ডিয়াতেই পূজা সম্পন্ন করা হয়। এই পিন্ডিয়াগুলি গোরা ও ইসারের প্রতীক রূপে মানা হয়। প্রখ্যাত গবেষক শীলা বসাক তাঁর 'বাংলার ব্রতপার্বণ' গ্রন্থে গণগৌরের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নবোঢ়া মেয়েরা এই ব্রত ১৮দিন পালন করে এবং এরা ছয়, আট কিংবা দশ বছর বয়সি কুমারী বান্ধবীদের বাবুল গাছের ছোট শাখা বা দাঁতন পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করে। পুজোর সময় এইসব নিমন্ত্রিত মেয়েরা উপস্থিত থাকে। মূল পুজারিকে নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের বিজোড় সংখ্যা হতে হয়।'[5] তবে অনেকেই পূজার সুপারি দিয়ে এই নিমন্ত্রণ সারেন।

পূজা শুরুর আগে ঘরের কোনো একটি পবিত্রস্থানে গণগৌরের চৌকি বা আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। নববিবাহিতা ও কুমারী কন্যারা মাথায় ঘট নিয়ে পার্শ্ববর্তী কোনো জলাশয় থেকে জল তুলে আনেন এবং সেই ঘট আমসরা, নারকেল, দূর্বাঘাস ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে মঙ্গলগীত গাইতে গাইতে ঘরে ফিরে আসেন। এই ঘট দেবীর প্রতীকস্বরূপ এবং এটিকে আসনের ডানদিকে রাখা হয়। পাশাপাশি একটি ষোলোআনা বা একটাকার মুদ্রার উপর একটি সুপারি রেখে সেটিকেও গণেশরূপে রোজ পূজা করা হয়। রোজ নানাবিধ পূজাসামগ্রী, যেমন, কুমকুম, চাল, লাল-হলুদ সুতো, ফুল, ফল, ভোগ ইত্যাদি দিয়ে পূজা সারা হয়। এই পূজার সময় সধবা মহিলারা রোজ নিজেদের বিবাহিত জীবনের প্রতীক

স্বরূপ দেওয়ালে কাজল, কুমকুম ও মেহেন্দির ষোলোটি করে ফোঁটা দেন এবং অবিবাহিত মেয়েরা আটটি করে ফোঁটা দেন। এরপর বিবাহিতারা ষোলটা করে এবং অবিবাহিতারা আটটি করে দূর্বাঘাসের ছড়া ও জলভর্তি ঘট হাতে নিয়ে দেবীর পূজা করেন ও ইচ্ছাপূর্তির নানাবিধ গান গেয়ে থাকেন ও ব্রতকথা শোনেন বা পড়েন। পিন্ডিয়াতে পূজা করার আটদিনের মাথায় মেয়েরা মাটি দিয়ে ইসার ও গোরার মূর্তি বানিয়ে পূজা করা শুরু করেন। মূলত শীতলা অষ্টমীর দিন বা 'বস্যোড়া'র দিন ঠান্ডা খাওয়ার পর এই মূর্তিতে পূজা শুরু হয়।[6] তবে অনেকক্ষেত্রে একটি মাটির পাত্রের মধ্যেও দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পাত্রকে 'কুন্ডা' বলা হয়। এরকম দুটি কুন্ডার প্রয়োজন হয়। ইসার ও গোরা ছাড়াও ইসারের ভাই 'কনিরাম' বা 'কানা', ইসারের বোন 'রোবা' এবং 'মালিন' বা 'মলন' নামক এক মালিনীর মূর্তিও থাকে। মালিনীকে বোঝাতে মাথায় ছোট্ট মাটির ফুলের ঝুড়ি করে দেওয়া হয়। রাজস্থানের বেশিরভাগ রাজপুত, ঠাকুর, বাণিয়া, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি পরিবারগুলিতে দেবদেবীর কাষ্ঠ নির্মিত বিগ্রহে পুজাপাঠ সম্পন্ন হয়। ব্রত উদযাপনের আগে মাথেরান ও উস্তা সম্প্রদায়ের স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে এই যুগলমূর্তি রঙ করিয়ে নেওয়া হয়।[7] বিকানির, যোধপুর, উদয়পুর, চিতোরগড় প্রভৃতি অঞ্চলের সূত্রকার সম্প্রদায় এই ধরণের পুতুল নির্মাণ করে থাকেন। কাষ্ঠ নির্মিত বলে মূর্তিগুলির মধ্যে যেমন একটি অনমনীয় ভাব বর্তমান থাকে তেমনই ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানী চিত্রকলার অনবদ্য অলংকরণ ও রঙের প্রয়োগ এগুলিকে আরোও আকর্ষণীয় করে তোলে। পাশাপাশি এখানকার মহিলা ও পুরুষদের ন্যায় এই দারুমূর্তিগুলিকেও রাজস্থানী সংস্কৃতির শাবেকি পোশাক ও অলংকারাদি দিয়ে সাজানো হয়। এই দেবমূর্তিগুলির মধ্য দিয়ে রাজস্থানের সমাজ ও সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

সাধারণত গণগৌরের বেদির মধ্যবর্তী স্থানে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থাপনার দিন একটি কুন্ডার মধ্যে মাটি দিয়ে গম, জোয়ার ইত্যাদি বীজবপন করা হয় এবং রোজ জলের ছিটা দেওয়া হয়। পরবর্তী দিনগুলিতে এই বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে যায়। এর সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে আছে পর্যাপ্ত শস্যোৎপাদন ও জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির কামনা। পূজার সময় দেবী গৌরীর দশরূপের পূজা করা হয়।[8] রোজ ব্রতকথা শোনার পর বিবাহিত মহিলারা স্বামীর মঙ্গলকামনা করে দেবীকে অর্পণ করা সিঁদুর থেকে নিজেদের সিঁথিতে সিঁদুর দেন। গণগৌরের পূজা যাঁরা করেন তাঁরা প্রতি রবিবার সূর্যের উদ্দেশ্যে 'সূরজ রোটো'র ব্রত করেন এবং সূর্যের উদ্দেশ্যে জল ও নৈবেদ্য 'রোট' নামক একপ্রকার মিষ্টান্ন দান করেন।

সাধারণ বিবাহিত মহিলারা ইসার ও গোরার মূর্তিতেই পূজা সম্পন্ন করেন। বিয়ের পর প্রথম বছর নবপরিনিতা ব্রতিনীরা তাঁদের বাপেরবাড়িতে এই পাঁচ-পুতুলের পূজা করেন। কুমারী মেয়েরাও এই পাঁচ-পুতুল নিয়েই নিজেদের ব্রত পালন করে থাকেন।

হোলির সাতদিনের মাথায় বাড়ির কুমারী মেয়েরা রোজ সন্ধ্যার সময় একটি ছিদ্রযুক্ত মাটির পাত্রে প্রদীপ জ্বেলে গণগৌরের গান গাইতে গাইতে সারা গ্রাম ঘোরে এবং স্থানীয় ঘরগুলি থেকে ঘি, তেল, গুঁড়, মিষ্টি, নগদ অর্থ, নানা ধরণের উপহার সামগ্রী ইত্যাদি জোগার করে আনে। এই ছিদ্রযুক্ত পাত্রটিকে স্থানীয় ভাষায় 'ঘুডলিয়া' বলে।[9] গণগৌরের শেষদিন ব্রতসমাপনের প্রতীক হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ঘুডলিয়াটি ভেঙ্গে ফেলা হয়।

গণগৌরের শেষ দুইদিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চৈত্রমাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি 'সিঞ্জারা' নামে পরিচিত। এই দিন বিবাহিত মহিলারা তাঁদের শ্বশুরবাড়ি থেকে নানাবিধ পোশাক, অলংকার, মিষ্টি ইত্যাদি উপহার স্বরূপ পান যা তাঁরা পরেরদিন অর্থাৎ তৃতীয়ার দিন পরেন।[10] শেষদিনটি গণগৌর উৎসবের সবথেকে আকর্ষণীয় দিন। লোককথা অনুযায়ী এইদিন গৌরী পতিগৃহের দিকে যাত্রা করেন। এইদিন ষোলজন এয়ো স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। এঁদের প্রচলিত নাম 'গোরণী' অথবা 'সুহাসিনী'। পূজাশেষে এই মহিলাদের ভোগ খাওয়াতে হয় ও অলংকার, বস্ত্রাদি, ষোলো শৃঙ্গার ইত্যাদি নানাবিধ মেয়েলি জিনিসপত্র ও দক্ষিণা দান করা হয়। এই বিশেষ দিন আটা ও গুঁড় দিয়ে 'গুনে' ও 'ফল' নামক বিশেষ মিষ্টান্ন বানানো হয় এবং দেবীকে অর্পণ করা হয়। উপরিউক্ত ষোলোজন মহিলাকে ষোলোটি করে গুনে ও ফল দান করা আবশ্যিক। এইদিন দেবদেবীকে বেসন দিয়ে তৈরি নানাধরনের অলংকার

প্রদান করা হয়।[11] এই বেসনের অলংকার নির্মাণে গৃহিণীরা নিজেদের বিশেষ শৈল্পিক দক্ষতার প্রমাণ দেন। বাংলার গয়না বড়ীর সঙ্গে এই বেসনের গয়নার খানিকটা হলেও সাদৃশ্য আছে।

এইদিন সন্ধ্যায় ব্রতিনীরা স্থানীয় কোনো 'বাবড়ী' অথবা 'জোহড়'[12] থেকে পবিত্র স্নান সেরে, নববস্ত্রে ও নবালংকারে সজ্জিতা হয়ে, হাতে মেহেন্দি লাগিয়ে দেবদেবীর যথোপাচারে পূজা করেন, ভোগ দেন এবং তাঁদের জল খাওয়ান। তারপর ইসার ও গোরার মূর্তি মাথায় নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বের হন। রাজস্থানের জয়পুরের গণগৌর শোভাযাত্রা, কোলকাতার দূর্গাপুজার বিসর্জনের শোভাযাত্রার মতোই বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ও পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। দেবদেবীর মূর্তিগুলিকে রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ও অলংকারে সুসজ্জিত করা হয়। এর পাশাপাশি হাতি, ঘোড়া, উট, ষাঁড়, ইত্যাদি পশুকে এবং নানাধরণের রথ তথা যানবাহনকে ঐতিহ্যবাহী রঙিন অলংকারে সাজিয়ে এই শোভাযাত্রায় বের করা হয়। এই শোভাযাত্রা উপলক্ষে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাজস্থানের লোকনৃত্য ও লোকগীতি ইত্যাদি বিবিধ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই বর্ণোজ্জ্বল সমারোহের সমাপ্তি ঘোষণা হয় বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। দেবদেবীর প্রতীমা বিসর্জনের পর ঘুড়লিয়া ভেঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেই এই বর্ণময় ব্রতের সমাপন ঘটে। গণগৌরের একটি উপাখ্যান অনুযায়ী মেয়েরা পূজার জন্য ফুল ও দূর্বাঘাস তুলতে গেলে বাগানের মালী তার বদলে নগদ অর্থ দাবী করে। মেয়েরা প্রতিশ্রুতি দেয় যে পূজা সমাপ্ত হলে তাঁরা মালীর ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে যাবে। তাই সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে অনেকে পূজা চলাকালীন যেসকল অর্থ জমা হয় সেগুলি সবই স্থানীয় কোনো মালীকে দান করেন।

গণগৌরের ব্রতের পালনের কোন সময় কি গান গাওয়া হবে তা সাধারণত নির্ধারিত থাকে। যেমন, সকালের গানের মধ্যে 'হরিয়ে গোবর', 'ওড়ো কোড়ো', 'কোট চিণইয়া' ইত্যাদি; দেবতাকে জল খাওয়ানোর গানের মধ্যে 'গোর তিসাই', 'ঈশরদাস বীরা কো কাংগসিয়া', 'কালো ভাটো' ইত্যাদি; রাতের গানের মধ্যে 'হর্‍্যা এ ঝুনবারা', 'ঝুটণা', 'গজরো' ইত্যাদি, বিসর্জনের গান বা বিদায়ের গানের মধ্যে 'মহে গোর ভুবাবণ', 'চাল্যারাজ', 'গোরা চলী সাসরজী' ইত্যাদি গানগুলি প্রচলিত।[13] এছাড়াও 'গোরবিন্দারো কা গীত', 'দুব ল্যা ন কা গীত', 'মাটী ল্যা ন কা গীত'সহ আরোও নানা ধরণের অজস্র গানের প্রচলন এই ব্রতকে সমৃদ্ধ করে তোলে।[14] এমনকি এগুলি ছাড়াও নানা ধরণের স্বরচিত গান ছড়া কেটে গাওয়ার রীতিও বিশেষ প্রচলিত।

কোলকাতায় গণগৌর ব্রতপালন ও কুমোরটুলির গণগৌর পুতুল: একসময় মারোয়াড়ী সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা রুজিরোজগার ও ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরেই প্রবাহিত হয়েছিল এই কল্লোলিনী কোলকাতার বুকে, বিশেষত উত্তর কোলকাতার শোভাবাজার, আহিরিটোলা, বড়বাজার, জোড়াসাঁকোসহ তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে। এই মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের মহিলাদের হাত ধরেই কোলকাতায় গণগৌরের আগমন ঘটেছে। জোড়াসাঁকোর বাঁশতলা এলাকায় অবস্থিত বলদেবজীর মন্দিরে ১৮৮০ সালে প্রথম গণগৌর উৎসবের আয়োজন করে 'বলদেবজী গ্বরজামাতা মণ্ডলী'। কোলকাতায় পালিত হওয়া এটিই প্রথম গণগৌর উৎসব।[15] উত্তর কোলকাতার কুমোরটুলি অঞ্চলের প্রতিমাশিল্পের কথা সর্বজনবিদিত। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা বংশপারম্পরিক ধারায় তাঁদের বৃহৎ প্রতিমা সৃজনের পাশাপাশি গণগৌরের পুতুলও নির্মাণ করে আসছেন অতি যত্ন সহকারে। কুমোরটুলির একজন প্রতিমা শিল্পী গৌতম পাল প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গণগৌরের পুতুল গড়ে চলেছেন।[16] তাঁর পূর্বে তাঁর বাবা স্বর্গীয় কালিপদ পালও এই কাজ করতেন। কুমোরটুলির প্রায় আট থেকে দশ ঘরে এই পুতুল নির্মাণের কাজ হয়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বিশ্বজিৎ পাল, সমর পাল, চন্দন পাল, শঙ্কর পাল প্রমুখরা এই পুতুল তৈরি করে থাকেন। কোনো কোনো শিল্পী কালীপূজার পর থেকে এবং কেউ কেউ সরস্বতীপূজার পর থেকেই এই পুতুল তৈরি করা শুরু করে দেন। কারণ এখানকার স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এই

চিত্র নং ৩ শিল্পী গৌতম পাল ও শিল্পসৃষ্টি

পুতুলগুলিকে মুম্বাই, দিল্লী, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে রপ্তানি করা হয়। ফলে গণগৌরের অনেক আগেই এই পুতুল তৈরির কাজ শিল্পীরা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেন। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী হোলির পরেও কিছু পুতুল তৈরি করা হয়।

কুমোরটুলির শিল্পীরা গণগৌরের দুই ধরণের পুতুল বানিয়ে থাকেন। একটি কুন্ডায় শুধুমাত্র ইসার ও গোরা থাকে এবং অপরটিতে ইসার ও গোরার পাশাপাশি কানা, রোবা ও মলনের পুতুল থাকে। এগুলি মারোয়াড়ী সংস্কৃতির দেবদেবীর পুতুল হলেও বাঙালী শিল্পীদের হাতে তৈরি হওয়ার ফলে এগুলিতে বাঙালীয়ানার ভাব স্পষ্ট। আপাতপক্ষে হলুদ বর্ণের পুতুলগুলিতে অতি সহজ সরল তুলির টানেই চোখ মুখ এঁকে দেওয়া হয়। এর উপর অভ্রের প্রলেপ, পুঁতি, চুমকির গয়নাগাটি, জড়ি বসানো চকমকি লাল বুটিদার কাপড় পুতুলগুলিকে অতিরঞ্জিত করে তোলে। যেন বাঙালী বাবু ও গিন্নীকে মারোয়াড়ী সাজে সাজিয়ে তোলা হয়। ফলে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব এই পুতুলগুলিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। তবে বাজারের চাহিদা মাথায় রেখে কিছু শিল্পী মারোয়াড়ী ঘরানায় গোলাপি বর্ণের গণগৌরের পুতুল বানাচ্ছেন যার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের এবং বিধাননগরের দক্ষিণদাঁড়ির বাজারচলতি ঠাকুরের মূর্তির প্রত্যক্ষ মিল বর্তমান।

চিত্র নং ৪ কুন্ডা সমেত ইশার, গোরা ও অন্যান্য

এবার আসা যাক পুতুল তৈরির কথায়। কুমোরটুলির এই পুতুলগুলি সবই ছাঁচে তৈরি করা হয়। কুন্ডার মধ্যে বসানো থাকে বলে এই পুতুলগুলির মাথা থেকে কোমরের নিচ পর্যন্ত গড়া হয়। পা সাধারণত থাকে না। বাকি অংশ কাপড়ে ঢাকা পরে যায়। এই মাথাসহ দেহাবয়ব একটি ছাঁচে ও হাতগুলি ভিন্ন ছাঁচে তৈরি করা হয়। পরে আঙুলের সাহায্যে সেগুলি দেহের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ইসার ও গোরার একটি হাত সামনের দিকে কিছুটা বিস্তৃত এবং অপর হাতটি অভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে থাকে। বাকিদের দুটি হাতই কুনুইএর কাছ থেকে সামনের দিকে বিস্তৃত অবস্থায় থাকে। গোরা ও রোবার মাথায় পানপাতার ন্যায় মুকুট এবং মলনের মাথায় একটি অতি সরল ভাবে গোলাকার ফুলের ঝুড়ি করে দেওয়া হয়। ইসার ও কানার মাথায় যেহেতু লাল রঙের পাগড়ী থাকে সেহেতু এঁদের মাথায় মুকুট থাকে না। এই পাগড়ীকে 'পেচা' বলা হয়। ইসারের কাঁধের কাছে ছাতা লাগানোর জন্য একটা ফুটো করে দেওয়া হয়। এই ছাতাটিও ছাঁচে বানানো হয় এবং এর দণ্ড হিসাবে একটি বাঁশের কাঠি যুক্ত করে দেওয়া হয়। পুতুলগুলি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর এগুলিকে প্রথমে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় রঙের কাজ। মূলত বাজারজাত ঠাকুর রঙ করার গুঁড়ো রঙ ব্যবহৃত হলেও অনেকেই ফেব্রিক, ইমালসান কালারের মতো রাসায়নিক রঙও ব্যবহার করেন। বার্নিশিং সাধারণত সব শিল্পীরা করেন না। তবে গোলাপি বর্ণযুক্ত পুতুলগুলিতে বার্নিশিং ও

চিত্র নং ৫ পুতুল রোদে শোকানোর অপেক্ষায়

ফিনিসিংএর চাকচিক্য চোখে পরার মতো। এগুলি সাধারণত পূর্ণাবয়বযুক্ত হয় এবং পা মুড়ে আসন পেতে বসার ভঙ্গিমায় থাকে।

হলুদ অথবা গোলাপি দিয়ে প্রাথমিক ভাবে সম্পূর্ণ পুতুলগুলিকে রঙ করে নেওয়ার পর সেগুলিকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। রোবা, মলন এবং গোরার অঙ্গবস্ত্র করার জন্য লাল, সবুজ, কমলা ইত্যাদি উজ্জ্বল বর্ণের রঙ শিল্পীরা ব্যবহার করেন। গোলাপি পুতুলগুলিতে স্প্রে রঙের ব্যবহারও করা হয়। হাতের চুড়ি, গলার হার, চোখ, মুখ, চুল এবং

চিত্র নং ৬ নানান আকৃতির কুন্ডা

চিত্র নং ৭ কুন্ডা চিত্রণে ব্যস্ত শিল্পী

ফিনিশিং টাচ দেওয়ার জন্য মূলত লাল ও কালো রঙ ব্যবহৃত হয়। তবে চুলে কালো রঙ করার পরেও যেমন পরচুলা পরানো হয় তেমনই রঙ ও রেখায় অলংকার করা হলেও তার উপর লাগামছাড়া অভ্রের ব্যবহার করা হয় এবং পুঁতি ও চুমকির গয়না পুনরায় পরানো হয়। সবশেষে জরি চুমকি লাগানো বস্ত্র পরিয়ে পুতুলগুলি সম্পূর্ণ হয়। পুরুষ পুতুলগুলির নিম্নাংশে জড়িদার সাদা ধুতি, গায়ে বুটিদার লাল উত্তরীয় ও মাথায় পেচা এবং মহিলা পুতুলগুলির নিম্নাংশে থাকে ঘাগরা ও ঊর্ধ্বাংশে ঘোমটার মতো করে চোলি্ থাকে। মহিলা চরিত্রগুলির নাকে ফুটো রাখা হয় নথ

পরানোর জন্য। গোলাপি বর্ণের পুতুলগুলির চুমকি ও জরিদার সৌখীন পোশাক, মণিমাণিক্যযুক্ত অলংকার, অতি রঞ্জিত সোনালী রঙের সিংহাসন ইত্যাদি বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে অনেকখানি সক্ষম হলেও এগুলির নান্দনিক গুণমান অনেকখানি ব্যহত হয়।

গৌতমবাবুর থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী বাটির ন্যায় পোড়ামাটির কুন্ডাগুলি কুমোরটুলিতে তৈরি হয়না। এগুলি আনা হয় নদীয়া জেলার মাঝদিয়া থেকে। কুমোরটুলির শিল্পীরা অতি দ্রুতহাতে এগুলিকে রঙ করেন। প্রাথমিক ভাবে হলুদ রঙ করার পর মোটাতুলির সরল টানে এগুলিতে লাল ফুল ও সবুজ লতাপাতার অলংকরণ করা হয়। পাঁচটি পুতুল ও কুন্ডা সমেত একটি অসাধারণ সংরচনার সৃষ্টি হয়। বাটি আকৃতি ব্যাতিত কাচাঁমাটির ময়ূরপঙ্খী নৌকা, পদ্মফুল, রাজসিংহাসন,

চিত্র নং ৮ নানা ধরণের কুন্ডা ও পুতুল

ময়ূরসিংহাসন, সুসজ্জিত মন্দিরের ন্যায় কুন্ডা এখানকার শিল্পীরাই তৈরি করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি অলংকরণকে ছাঁচে বানিয়ে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে বিষয়টির আদল দেওয়া হয়। যেমন, ময়ূরপঙ্খী নৌকাটি বানানোর জন্য প্রথমে নৌকার ন্যায় একটি কাঠামো বানিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ময়ূরের মুখ, অলঙ্কৃত পৃষ্টপাখনা, পুচ্ছ ও অন্যান্য অলংকরণ আলাদা আলাদা ছাঁচে বানিয়ে সেগুলি মূল কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এই একই ভাবে সিংহাসনগুলিকেও তৈরি করা হয়। এগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে মনমতো উজ্জ্বল রঙ করা হয়। এমনকি এগুলিকেও নানা রঙের চুমকি, জড়ি, অভ্র, ময়ূরপুচ্ছ ইত্যাদি দিয়ে যারপরনাই সাজিয়ে তোলা হয়। পুতুল ও কুন্ডা সাজানোর এইসব কাঁচামালগুলি আসে নিকটবর্তী বড়বাজার থেকে। সাধারণত গণগৌরের মরসুমে সাদামাটা কুন্ডাযুক্ত পাঁচ-পুতুলগুলি আড়াইশো-তিনশো টাকা থেকে শুরু হয় এবং অত্যালংকৃত কুন্ডাগুলির দাম প্রায় দেড়-দুই হাজার টাকা ছাড়িয়ে যায়। এইসময় বড়বাজারসহ স্থানীয় বাজারগুলিতে কুমোরটুলির এই পুতুলের পসার বসে।

কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গণগৌর উৎসবের ধারা: কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির যেখানে যেখানে মারোয়াড়ী সমাজ বসতি স্থাপন করেছে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে সেখানেই তাঁদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় তাঁদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলিও খুব সহজেই মিলেমিশে গেছে। উত্তর কোলকাতার শোভাবাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা ছাড়াও বিধাননগর, কাঁকুড়গাছি, সল্টলেক, হিন্দমোটর, হাবড়া, লিলুয়া ইত্যাদি নানা জায়গাতেও গণগৌরের আয়োজন করা হয়। কাঁকুড়গাছির ‘পূর্ব কোলকাতা মহেশ্বরী সভা’ নামক একটি মারোয়াড়ি সংগঠন একদশকের বেশি সময় ধরে গণগৌর উৎসবের আয়োজন করে আসছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এই সংগঠনের দ্বারা আয়োজিত উৎসব ও অনুষ্ঠানে প্রায় বারো’শোএর উপর সদস্য তাঁদের পরিবারের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে থাকেন।[17] সল্টলেকের শ্রীভূমিতে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে ‘ঈশ্বরজামাতা ভিআইপি অঞ্চল’ নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দুর্গাপূজার মতো করেই গণগৌর উৎসবের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সল্টলেকের জিসি ও এফডি ব্লকে, হিন্দমোটরের দ্বারিক জাঙ্গল স্ট্রীট ও দেশবন্ধু নগরে, হাবড়ার

মিলস্ ক্লাব হাউস এলাকাতেও বিভিন্ন মারোয়াড়ী সংগঠনের উদ্যোগে গণগৌর উৎসবের আয়োজন করা হয়। হাবড়ায় গণগৌর উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের পাশাপাশি তিনদিনের মেলারও আয়োজন করা হয়।[18]

বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন ব্রত ও গণগৌরের সাদৃশ্যগত দিকসমূহ: স্বামী, সন্তান, পরিবারের সার্বিক মঙ্গলকামনার্থে, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি, শস্য ও সম্পদ বৃদ্ধির তাগিদে, উপযুক্ত স্বামী পাওয়ার আশায়, অখন্ড সৌভাগ্যবতী ও পতি সোহাগিনী হওয়ার আশায় বাংলার নারীদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কিছু ব্রতের সঙ্গে গণগৌর ব্রতের বিশেষ মিল লক্ষ্যনীয়। নারীমনের কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি দিকগুলির বাস্তবিক রূপায়নের আশায় গড়ে ওঠা এই ব্রতগুলি স্থানভেদে ও উপস্থাপনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলেও, এগুলির উদ্দেশ্যগত দিকগুলি মোটামুটি একই। ফলে সাদৃশ্য থাকাটা খুব একটা অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

উর্বরতা ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে অতোপ্রত ভাবে জড়িত শিবরাত্রির ব্রতের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত পতিলাভ। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা শিবরাত্রির ব্রত করেন উপযুক্ত স্বামী, সংসার ও সন্তানলাভের আশায় এবং বিবাহিত মহিলারা এই ব্রত রাখেন সংসারের সার্বিক মঙ্গলকামনার্থে। একইভাবে গণগৌর ব্রতও শিব ও শক্তির আরাধনাকেই সূচিত করে। পাশাপাশি গণগৌর ব্রত ও শিবরাত্রির ব্রত পালনের উদ্দেশ্যেও বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এপ্রসঙ্গে গণগৌরের সময় রাজস্থানের কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ প্রথার কথা বলতেই হয়। এইদিন অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলারা সুযোগ পান একে অপরের সান্নিধ্যে আসার এবং নিজেদের উপযুক্ত জীবন সঙ্গীকে বেছে নেওয়ার।[19] শিবরাত্রির ন্যায় এই গণগৌর ব্রতও সেই উর্বরাতন্ত্র ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির ধারনাকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তবে শিবরাত্রির ব্রত যেমন মহিলা ও পুরুষ উভয়েই পালন করতে পারেন, গণগৌরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলারাই এই ব্রত করে থাকেন।

পার্বতী নিজ তপগুণে শিবকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন। সেই কামনাকে চরিতার্থ করতেই সারা বৈশাখ মাস জুড়ে কুমারী মেয়েরা শিবব্রত পালন করে। প্রতিদিন মাটি দিয়ে একটি করে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শিবলিঙ্গ বানিয়ে ব্রতের যথাযথ নিয়মে পূজা সম্পন্ন করে এবং জল ঢালার সময় তিনবার মন্ত্রোচ্চারণ করে। যেমন,

'শিল শিলাটন শিলে বাটন শিল অঝ্ ঝরে ঝরে।
স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব-গৌরী কি ব্রত করে।।
নড়ে আশ নড়ে পাশ নড়ে সিংহাসন।
হরগৌরী কোলে ক'রে গৌরী আরাধন।।'[20]

অখন্ড সৌভাগ্যলাভ, সন্তানপ্রাপ্তী ও আজীবন সধবা থাকা, সংসারের সুখসমৃদ্ধির আশা নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে বাংলার নারীসমাজ দ্বারা পালিত সেঁজুতি ব্রতের সঙ্গেও গণগৌরের বিশেষ উদ্দেশ্যগত মিল পাওয়া যায়।

ইতুপূজার সঙ্গেও গণগৌরের বিশেষ মিল লক্ষণীয়। শস্য, উর্বরতা বৃদ্ধি, প্রজনন, সাংসারিক সুখ ও ঐশ্বর্য, পুত্রলাভ, স্বামীলাভ, স্বর্গলাভ ইত্যাদি নানাবিধ কামনা পূরণের আশা নিয়ে বিবাহিতা ও কুমারী উভয়েই এই ব্রত পালন করে থাকেন।[21] স্থানভেদে ইতুপূজার রকমফের থাকলেও মোটামুটি সারা অগ্রহায়ণ মাস জুড়েই ইতুপুজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অনেক স্থানেই ইতুপূজা উপলক্ষে পরিবারের মহিলারা তাঁদের স্বামী ও সন্তানসন্ততির নাম করে ছোট ছোট ঘট পাতেন ও তাতে ধানের শিষ, ওগরা ধান, ক্যাজরা, কলমি, হিমচে, তুলসী পাতা, বেলপাতা, মুলোফুল, সর্ষেফুল ইত্যাদি শাকসবজি ও শস্য দেন এবং তাতে জল ঢালেন, ব্রতকথা শোনেন অথবা পাঠ করেন। সংক্রান্তির দিন ঘট বিসর্জন দিয়েই ব্রতিনীর ব্রত সম্পন্ন হয়।[22] অনেকে সরার মধ্যেও একই প্রথায় ইতুপূজা করে থাকেন। গণগৌরে একটু অন্যভাবে হলেও বিবিধ বীজবপন করে তাতে রোজ জলদান, অঙ্কুরিত বীজের পূজা, দূর্বাঘাসের বিশেষ ব্যবহার ইত্যাদি দিকগুলি সেই শস্যপূজারই ইঙ্গিতবাহী। পাশাপাশি ইতুপূজা স্থানভেদে সূর্য, লক্ষ্মী, নারায়ণের পূজা হলেও ইতুপূজার কোনো কোনো ব্রতকথায় হরগৌরীর পূজার কথাও বলা হয়। যেমন,

১. 'একখান ক্ষেতে সাতখান আল
ধান বুনেছি নানা শাল
সে ধান কি হবে?
হরগৌরীর পূজা হবে।'
২. 'এলক্যাজরা বেল ক্যাজরা, ক্যাজরা ফুলের পাতা
তাই দিয়ে পূজা হবে হরগৌরীর মাথা' ইত্যাদি।[23]

পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার কিছু অংশে কুমারী মেয়েরা ভাদ্র মাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত ভাঁজো ব্রত পালন করে থাকেন যা শস্য ও উর্বরতাশক্তির আরাধনার একটি মাধ্যম। এপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মন্থনষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য-মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা-একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে, বাকি শস্য সরষে এবং ইদুরমাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান ক'রে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ-বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্রদ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান।'[24] অর্থাৎ গণগৌর ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই ব্রতের বেশখানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কুমারীদের দ্বারা পালিত ভাঁজো ব্রতেও আছে উর্বরতাতন্ত্রের অনুষঙ্গ। এই ব্রতকে ঘিরে করা নাচগানের অনুষ্ঠানের সঙ্গেও গণগৌরের নাচগান করে ব্রত পালনের দিকটির মিল লক্ষ্য করা যায়। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ষাট ব্রতেও পঞ্চশস্যদানার ব্যবহার করা হয়। এগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার পর এগুলিকে একসঙ্গে বেঁধে লক্ষ্মী, বাসুদেব ও হরগৌরীর পূজা করা হয়।[25]

সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর সংসার ও দাম্পত্যজীবন পাওয়ার কামনায় মেদিনীপুরের কুমারী মেয়েরা বালুকা ব্রত করে থাকেন। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত অথবা স্থানভেদে ঐ মাসের শুক্লাপক্ষের সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত পালিত হয়। এই ব্রতের একটি অনুষঙ্গ হল কুমারী মেয়েরা ভোরবেলা সমবেত হয়ে কোনো নদী বা জলাশয়ের ধারে যায় ও সেখানের বালি অথবা কাদামাটি দিয়ে একটি সাময়িক মূর্তি গড়ে পূজা করে।[26] এক্ষেত্রে গণগৌরের ইসার ও গোরার মাটির মূর্তি গড়ে পূজা করার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। গণগৌরের একটি ব্রতকথাতে পার্বতী কোনো এক জলাশয়ে স্নান সেরে সেই জলাশয়ের পাশেই কাদামাটি অথবা বালি দিয়ে শিবের সাময়িক মূর্তি গড়ে নিভৃতে তাতে পূজা করেছিলেন বলে বর্ণীত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের মেলেনি ব্রতেও কুমারী মেয়েরা মাটি দিয়ে মেলেনির মূর্তি বানায়, তাঁর নামে পুকুর কাটে, সেই পুকুরে তাঁকে স্নান করিয়ে, হলুদ মাখিয়ে, নানাবিধ কাপড় ও অলংকারে সাজিয়ে সারা চৈত্রমাস জুড়ে, নানারকমের শস্য, ফলমূল, ফুল ইত্যাদি দিয়ে ষোড়শোপাচারে তাঁর পূজা করে। মেলেনি মুর্শিদাবাদের কোনো এক স্থানীয় দেবী এবং এই ব্রতের পিছনেও আছে সুখী দাম্পত্যজীবন লাভের কামনা।[27]

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত রোজ সকালে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার নারীরা তোষলা অথবা তুঁষতুষলি নামক যে ব্রত করেন তার একটি আচারের সঙ্গে গণগৌরের বিশেষ মিল পাওয়া যায়। গণগৌরে যেমন হোলিকা দহনের পর তার ছাই দিয়ে ষোলোটি পিন্ডিয়া বানিয়ে তাতে পূজা করা হয় এবং কুন্ডাতে নানাধরনের বীজ বপন করে তাতে জল দেওয়া হয়, তেমনই তুঁষতুষলি ব্রতেও গোবরের ১৪৪টা ডেলা পাকিয়ে তার মধ্যে দূর্বাঘাসের ছড়া গুঁজে, সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তুঁষতুষলি ব্রতকে 'সারমাটি দিয়ে খেত উর্বর করে তোলার ব্রত' বলেছেন।[28] আবার সংসারের সার্বিক মঙ্গলকামনা ও একজন পতিব্রতা সতীনারীর যা যা কামনা বাসনা তা সবই এই ব্রতের ছড়ায় নিহিত রয়েছে। এই তুঁষতুষলি ব্রত ও টুসু পূজাকে অনেক গবেষক এক করেই দেখেন। যদিও এবিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। মূলত বাঁকুড়া,

মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় সারম্বরে পালিত হওয়া টুসুপূজাও গণগৌরের মতোই নৃত্যগীতপ্রধান উৎসব।[29] রঙিন কাগজ, চুমকি, জড়িকাপড়, রাংতা ইত্যাদি সহযোগে সজ্জিতা টুসু পুতুলের সঙ্গে কুমোরটুলি অঞ্চলে তৈরি হওয়া গণগৌরের পুতুলের বিশেষ মিল চোখে পড়ে।

স্বামীর সোহাগ পেতে ও সুখী দাম্পত্য জীবনের আশায় বাঙালী সধবা মহিলারা বৈশাখ মাসে যে আদর সিংহাসন ব্রত পালন করেন, সেই ব্রতের রীতি অনুসারে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন সতীসাধ্বী স্ত্রীকে নানা রকমের উপহার সামগ্রী ও দক্ষিণা দিয়ে বিবিধ ভোজন করানো হয়। গণগৌর ব্রতশেষেও ব্রতিনীরা একইভাবে ষোলোজন গোরণীকে সধবার ব্যবহৃত নানা সামগ্রী, দক্ষিণা, গুনে ও ফল এবং বিবিধ ভোজন দান করেন।

এগুলি ছাড়াও বাংলার নারীসমাজে এমন অনেক ব্রত প্রচলিত আছে যেগুলির উদ্দেশ্যগত দিকের সঙ্গে গণগৌর ব্রতের সাদৃশ্য বর্তমান। উদাহরণ স্বরূপ স্বামী, সন্তান তথা পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করে পালন করা নখছুট ব্রত, কুলকুলতি ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, ষষ্ঠীর ব্রত; সংসারের শ্রীবৃদ্ধি, ধন-ধান্য-ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধির কামনা করে লক্ষ্মীর ব্রত, বসুধারা ব্রত, মাঘমঙ্গল ব্রত; স্বামী সোহাগী হওয়ার আশায় ও সুখী দাম্পত্য জীবন পাওয়ার আশায় করা সুবচনী ব্রত, সৌগাভ্যচতুর্থী ব্রত, সোমবতী ব্রত; মনের মতো উপযুক্ত স্বামী ও সংসার পাওয়ার আশায় পালিত দশপুতুলীর ব্রত, সানঝা ব্রত ইত্যাদি ব্রতগুলির কথা এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে।

বাংলার বাইরে মধ্যপ্রদেশে গণেশ চতুর্থীর আগেরদিন তৃতীয়াতে কুমারী ও সধবা মহিলার তীজ ব্রত পালন করেন।[30] এই ব্রতের আচার হিসাবে ১৫ দিন বা একসপ্তাহ আগে আটটি ঝুড়িতে গোবর মাটি নিয়ে তাতে গমের বীজ বপন করে। সেই বীজ অঙ্কুরিত হলে তৃতীয়ার দিন নদী বা অন্যকোনো জলাশয় থেকে বালি বা মাটি তুলে, তা থেকে শিবের মূর্তি গড়ে সেটির পূজা করেন। সাংসারিক সার্বিক সুখ শান্তি কামনায় করা এই ব্রতের সঙ্গে গণগৌরের নিয়মাচারের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। রাজস্থানে তীজ উৎসব মূলত বর্ষাকে স্বাগতম জানাতে ও উর্বরতাশক্তির আরাধনায় পালিত হয়। আবার বিহারে সধবারা এই ব্রত পালন করেন সংসার ও স্বামীর মঙ্গলকামনা করে।

পরিশেষে বলার প্রয়োজন, যে মঙ্গলময় ইশ্বরের কথা প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, যিনি সবকিছুর রচয়িতা, সেই 'ইশ্বর'এর জন্ম কিন্তু মানুষের কল্পনাতে ভর করেই। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই এই অপার প্রকৃতির সবকিছুই মানুষকে কৌতূহলী করেছে। এই পৃথিবীর যা কিছুই অমীমাংসিত, যা কিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তার সঙ্গেই সে জুড়ে দিয়েছিল তার অলৌকিকধর্মী কল্পনাকে, তার বিশ্বাসকে। এই বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল সেই অপার্থিব শক্তিধরকে, যে এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীব মানুষকে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সকল শুভাশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করবে। মানুষ নিজের মতো করেই তাঁর রূপদান করেছে। একসময় নিজ গোষ্ঠী, নিজের পরিবার তথা নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে এই শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবকিছুই মানুষ পালন করতে শুরু করল। ব্রত তারই একটি দিক। বিশেষত নারীদের মধ্যেই ব্রতের প্রচলন বেশি হলেও এমন অনেক ব্রত আছে যেখানে পুরুষেরাও অংশগ্রহণ করেন। তবে সেই সুপ্রাচীনকাল ধরে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীদের সংসারকেন্দ্রীক জীবনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। নিজ সংসার, নিজ পরিবার, পিতা-স্বামী-পুত্রের সার্বিক মঙ্গলকামনাই তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ব্রত করার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই তো মনস্কামনাপূরণ। আবার নিজ মনের ভাব ও চাহিদা প্রকাশেরও একটি সরল মাধ্যম এই ব্রত। তাই অনেক ব্রতের আলপনায় এসেছে নারীর কাঙ্ক্ষিত অলংকারাদি, বিলাসবহুল আসবাবপত্র ও বাসনপত্র, গোলাভরা ধান, পাকা বাড়ি ইত্যাদির চিত্র। হয়তো দেবতার কাছে এগুলি চাওয়ার অছিলায় পরোক্ষভাবে সে নিজ স্বামীর কাছেই এগুলির আবদার করছে এবং আঁকছে তাঁর পতিদেবতার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেই। একটি নারীর শিশু থেকে পরিণীতা হয়ে ওঠার যাত্রা পথে কি করণীয় এবং কি নয় তার শিক্ষাও সে পায় এই ব্রতগুলি থেকে। এককালে কুমারী মেয়েরা যেমন আসন্ন সংসার জীবনে সুগৃহিণী হওয়ার পাঠ তাঁদের পুতুল খেলা থেকে ও নানাবিধ কুমারী ব্রতের মধ্যে দিয়ে পেত তেমনই সধবা মহিলাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা সবই তাঁদের সংসারকে ঘিরেই আবর্তিত হতো। ফলে সধবা ব্রতগুলিতেও তাঁদের সংসারকেন্দ্রীক মনস্কামনাই প্রধান্য পেত। তাই ব্রতের

সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনীগুলির মধ্যেও লুকিয়ে থাকে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার ও তাঁর থেকে মন মতো বর পাওয়ার বার্তা। তা সে যেখানেরই ব্রত হোক না কেন।

অশেষ কৃতজ্ঞতা - মিনা ডালমিয়া, গৌতম পাল (কুমোরটুলি), বিমলা মণ্ডল (সোনারপুর), মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায় (কসবা)।

তথ্যসূত্র:

১ https://www.holifestival.org/gangaur.html (Accessed 19th March, 2020, Time- 7 p.m.)

২ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gangaur (Accessed 19th March, 2020, Time- 7.15 p.m.)

৩ সাক্ষাৎকার- মিনা ডালমিয়া, বয়স ৫০ বছর (আনুমানিক), স্থানীয় বাসিন্দা, ৪৯৯, রবীন্দ্র সরণী, কুমোরটুলি মোড়, কোলকাতা ৭০০০০৫, তারিখ- ১৬ই মার্চ, ২০২০, সময়- বেলা ১২টা।

৪ राजगढिया, चम्पादेवी (एन.डि.), बारह महीनों का त्योहार, कलकत्ता: माइका हाउस, पृ. १३८-१४५.

৫ বসাক, শীলা (২০১৭), বাংলার ব্রতপার্বণ, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পুনঃমুদ্রিত, পৃ. ৩৬৬।

৬ ঠান্ডা খাওয়া বলতে শীতলা পূজার পর আগেরদিনের বাসি খাবার ঐদিন খাওয়ার প্রথাকে সূচিত করে। তথ্যসূত্র-মিনা ডালমিয়া, বয়স ৫০ বছর (আনুমানিক), স্থানীয় বাসিন্দা, ৪৯৯, রবীন্দ্র সরণী, কুমোরটুলি মোড়, কোলকাতা ৭০০০০৫, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১৬ই মার্চ, ২০২০, সময়- বেলা ১২টা।

৭ Ranjan, Aditi & M P Rajnan (eds) (2014), Crafts of India Handmade of India, New Delhi: Council of Handicraft Development Corporation (COHANDS), Reprinted. P. 101.

৮ এই দশ রূপ হল গৌরী, উমা, লতিকা, সুভাগা, ভগমালিনী, মনোকামনা, ভবানী, কামদা, ভোগবর্দ্ধিনী ও অম্বিকা। https://www.festivalsofindia.in/gangaur/%EO%A4%97%EO%A4%A3%EO%A4%97%EO%A5%8C%EO%A4%BO/amp (Accessed 21st March, 2020, Time- 7.30 p.m.)

৯ https://www.holifestival.org/gangaur.html (Accessed 20th March, 2020, Time- 6.30 p.m.)

১০ राजगढिया, चम्पादेवी (एन.डि.), बारह महीनों का त्योहार, कलकत्ता: माइका हाउस, पृ. १६३.

১১ Gupta, Jaya (2020), "gangaur vrat pooja vidhi", (Accessed 28th March, 2020, Time- 10 a.m.)
https://youtu.be/iu1wXbXAxYI

১২ স্থানীয় ভাষা অনুযায়ী বাবড়ী এবং জোহড় বলতে পুকুর অথবা কোনো প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট জলাশয়কে বোঝায়।
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gangaur (Accessed 19th March, 2020, Time- 7.20 p.m.)

১৩ बिहाणी, सरला कुमारी व शान्ति देवी बिहाणी (एन.डि), आधुनिक मारबाड़ी गीत संग्रह, कोलकाता: भोलानाथ पुस्तकालय, पृ. २८८-३१६.

১৪ राजगढिया, चम्पादेवी (एन.डि.), बारह महीनों का त्योहार, कलकत्ता: माइका हाउस, पृ. १४०-१५८.

১৫ Vyas, Rajendra (2020), "गूंजने लगे गणगौर के गीत", Kolkata: Patrika, 18 March. (Accessed 28th March, 2020, Time- 11 a.m.)
https://m.patrika.com/amp-news/kolkata-news/social-religious-festival-gangaur-5908863/

১৬ সাক্ষাৎকার- গৌতম পাল, বয়স ৬০ বছর (আনুমানিক), মৃৎশিল্পী, ৪৯৯, রবীন্দ্র সরণী, কুমোরটুলি মোড়, কোলকাতা ৭০০০০৫, তারিখ- ১৭ই মার্চ, ২০২০, সময়- বিকেল ৪টে।

১৭ By a Staff Reporter (2016), "Gangaur - A women's affair", Kolkata: The Telegraph online edition, 16 June. (Accessed 28th March, 2020, Time- 11.30 a.m.)
https://m.telegraphindia.com/states/west-bengal/gangaur-nbps-a-women-rsquo-s-affair/cid/1471852

[১৮] Rahi, Shishir Sharan (2019), "लोक आस्था का महापर्व गणगौर आज से", Kolkata: Patrika, 7 April. (Accessed 28th March, 2020, Time- 11.45 a.m.) https://m.patrika.com/kolkata-news/gangaur-festival-starts-from-sunday-at-kolkata-4392362/

[১৯] https://www.tourism.rajasthan.gov.in/fairs-and-festivals/gangaur-festival.html (Accessed 19th March, 2020, Time- 7 p.m.)

[২০] নির্ম্মলানন্দ, স্বামী (২০১২), বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ কি ও কেন?, কোলকাতা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পুনঃমুদ্রিত, পৃ. ১২।

[২১] বসাক, শীলা (২০১৭), বাংলার ব্রতপার্বণ, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পুনঃমুদ্রিত, পৃ. ১৮২-১৮৩।

[২২] ক্ষেত্রসমীক্ষা- নোয়াপাড়া, সোনারপুর, থানা+ডাকঘর- সোনারপুর, কোলকাতা ৭০০১৫০, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ- ১৭ই ডিসেম্বর, ২০১৯, সময়- দুপুর ১.২০মিনিট।

[২৩] তথ্য সৌজন্য- বিমলা মণ্ডল, বয়স- ৮০ বছর (আনুমানিক), গৃহবধূ, নোয়াপাড়া, সোনারপুর, থানা+ডাকঘর- সোনারপুর, কোলকাতা ৭০০১৫০, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১৭ই ডিসেম্বর, ২০১৯, সময়- দুপুর ১.৩০মিনিট।

[২৪] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০১৫), বাংলার ব্রত, কোলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনঃমুদ্রিত, পৃ.৬৩।

[২৫] বসাক, শীলা (২০১৭), বাংলার ব্রতপার্বণ, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পুনঃমুদ্রিত, পৃ. ২৮০-২৮১।

[২৬] তদেব, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

[২৭] তদেব, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

[২৮] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০১৫), বাংলার ব্রত, কোলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনঃমুদ্রিত, পৃ.৩২।

[২৯] বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ (২০০৮), বাংলার লৌকিক দেবতা, কোলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পুনঃমুদ্রিত, পৃ.১৩৭।

[৩০] বসাক, শীলা (২০১৭), বাংলার ব্রতপার্বণ, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পুনঃমুদ্রিত, পৃ. ৩৫৭।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০১৫), বাংলার ব্রত, কোলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনঃমুদ্রিত।

নির্ম্মলানন্দ, স্বামী (২০১২), বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ কি ও কেন?, কোলকাতা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পুনঃমুদ্রিত।

বসাক, শীলা (২০১৭), বাংলার ব্রতপার্বণ, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পুনঃমুদ্রিত।

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ (২০০৮), বাংলার লৌকিক দেবতা, কোলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পুনঃমুদ্রিত।

बिहाणी, सरला कुमारी व शान्ति देवी बिहाणी (एन.डि), आधुनिक मारबाड़ी गीत संग्रह, कोलकाता: भोलानाथ पुस्तकालय।

राजगढिया, चम्पादेवी (एन.डि.), बारह महीनों का त्योहार, कलकत्ता: माइका हाउस।

Ranjan, Aditi & M P Rajnan (eds) (2014), Crafts of India Handmade of India, New Delhi: Council of Handicraft Development Corporation (COHANDS), Reprinted।

চিত্রসূত্র:

সকল চিত্র ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে সংগৃহীত (৪৯৯, রবীন্দ্র সরণী, কুমোরটুলি মোড়, কোলকাতা ৭০০০০৫, তারিখ- ১৭ই মার্চ, ২০২০)।